স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা স্বরধ্বনি

ভাষায় জন্য উচ্চারিত ধ্বনি গুলির একটি প্রকরণ হলো স্বরধ্বনি। যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে সরাসরি কোন বাধা পায় না, কিন্তু জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থানের কারণে এগুলোতে ধ্বনিগত কিছু পরিবর্তন আসে, সে সকল ধ্বনিই হলো স্বরধ্বনি। যে সকল চিহ্ন দিয়ে এই ধ্বনিসমূহ প্রকাশ করা হয়, সেগুলোর প্রত্যেকটি স্বরচিহ্ন বা স্বরবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি। এগুলো হলো— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

মৌলিকতার বিচারে স্বরধ্বনির সংখ্যা মাত্র ৭টি। এই ধ্বনিগুলো হলো—অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং এ্যা । এগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি (Primery Cardinal Vowels)। অনেকে বাংলায় ৮টি মৌলিক স্বরধ্বনির কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে, ৮টি ধ্বনি পাওয়া যায় না।

মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ গ্রন্থে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি হিসাবে ‘অভিশ্রুত ও’ নামক একটি ধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ‘স্বাভাবিক ও’ ও ‘অভিশ্রুত ও’-এর মধ্যে মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে- ওষ্ঠের কম গোল বেশি গোলকে যেভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন, বাস্তবে তা সকল ক্ষেত্রে ঘটে না। তিনি স্বরবর্ণের মৌলিক অবস্থানের ছকে এই দুই ও-কে খুব কাছাকাছি দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে ‘অভিশ্রুত ও’-কে বলেছেন সিকি-সংবৃত। মূলত এই দুটো ও-এর উচ্চারণগত যে প্রভেদ একেবারেই নেই তা বলা যায় না, কিন্তু তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি হিসাবে বিবেচনা না করে- ও ধ্বনির একটি প্রকরণ হিসাবেই বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়। যে কারণে ই, ঈ এবং উ, ঊ মৌলিকতার বিচারে চারটি ধ্বনি বিবেচনা না করে, দুটো ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সুকুমার সেন তাঁর ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে দুটি 'আ' ধ্বনিকে মৌলিক ধ্বনি তালিকায় গ্রহণ করেছেন। এই দুটো ধ্বনির একটিকে তিনি আ (আ হ্রস্ব) ও আ (আ দীর্ঘ) নামে চিহ্নিত করেছেন। একথা সত্য যে, বাংলাতে কোনো কোনো ক্ষেত্র দীর্ঘ-আ অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে ব্রজবুলিতে দীর্ঘ আ-এর উচ্চারণ যথাযথভাবে না করলে, শব্দের স্বমহিমা নষ্ট হয়। [দেখুন :আ]

দীর্ঘ-হ্রস্বের এই পার্থক্য থাকলেও, একে মৌলিক ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা না করে- আ ধ্বনির প্রকরণ হিসাবেই বিবেচনা করা উচিৎ। এছাড়া আ ধ্বনিটি যেখানে ভাবকে বিস্তৃত করে, সেখানে দীর্ঘ করলেই ভালো শোনায়। যেমন আসমুদ্রহিমাচল। এই শব্দের আ দীর্ঘ না করলে দোষ নেই, কিন্তু দীর্ঘ করলে অর্থের বিচারে শব্দটি স্বমহিমা পায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধ্বনির ‘ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ গ্রন্থে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারে বাংলা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে না বলে দাবী করেছেন। কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ পরিবর্তনে ভাবগত মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি যে ঘটে থাকে, তার বিচার করেন নি।

উল্লিখিত বৈয়াকরণরা ছাড়াও অনেকেই মৌলিক ধ্বনি নিরুপণে শব্দের অর্থ নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে অর্থের পার্থক্য হলেই তা মৌলিক ধ্বনির ভিতর আনতে হবে তার কোন অর্থ হয় না। বড় জোর হ্রস্ব-দীর্ঘের বিচারে তাকে একটি মৌলিক ধ্বনির প্রকরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বাংলাতে সকল ক্ষেত্রে এই হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ দিয়ে অর্থ পার্থক্য নিরুপণ করাও যায় না। কারণ—

১. যে সকল শব্দের দুটো অর্থ রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে অর্থের তারতম্যটা কখনো কখনো কানে ও মনে ধরা পড়ে বটে, কিন্তু যে সকল শব্দের অর্থ দুইয়ের বেশি আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে? যেমন একটি শব্দ ‘কর’। এর অর্থগুলোকে যদি পরপর লিখি, তাহলে তার রূপটি দাঁড়াবে নিচের তালিকার মতো-

কর : ক। হাত। খ। আলো, কিরণ, জ্যোতি। গ। রাজস্ব, খাজনা, শুল্ক ঘ। বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বংশগত পদবী (সুশীল কর)। ঙ। উৎপন্ন অর্থে প্রত্যয় (সুখকর, হিতকর)। চ। করা অর্থে ক্রিয়াপদ (তুচ্ছার্থে)। তুই এ কাজটি শীঘ্র কর।

২. ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণগত পার্থক্যে একই ধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ রূপে পার্থক্য ঘটে থাকে। আবার বাক্যের ভাব অনুসারেও উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ রূপ পাল্টে যেতে পারে। যেমন— কোনো কিছু অনুমোদন করা অর্থে আমরা ‘বেশ’ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। যখন তাড়াহুড়োর ভিতর অনুমোদন করি তখন ‘বেশ’ ছোট করে বলি। কিন্তু যখন প্রশান্ত মনে মাথা কাত করে আয়েসে অনুমোদন করি, তখন তা প্রলম্বিত হয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য

স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য, প্রাথমিকভাবে তিনটি বিষয় বিচার করা হয়। এই দিক তিনটি

হলো—

১. জিহ্বার অবস্থান : স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে সামনে, পিছনে, উপরে নিচে সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। তাই এই ক্ষেত্রে জিহ্বার অবস্থানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

২. জিহ্বার উত্থানগত পরিমাপ : জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্নচোয়ালের মধ্যভাগে শায়িত অবস্থায় থাকে। ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার বিভিন্ন অংশ উত্তোলিত করা হয়। জিহ্বার এই অংশ বিশেষের ব্যবহারের ধরনের উপর স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি নির্ধারিত হয়।

৩. ঠোঁটের আকৃতি : স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা ঠোঁটকে কখনো গোল করা হয় বা কখনো প্রসারিত করা হয়। স্বরধ্বনি ভেদে ঠোঁটের এই আকারগত পরিবর্তনকেও বিবেচনায় আনা হয়।

প্রতিটি ভাষাতেই স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় দুটি প্রক্রিয়ায়। এর একটি হলো— স্বাধীন বা মুক্তি স্বরবর্ণ। যেমন : অতি শব্দের অ। এর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হলো- ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত অবস্থা। একে যুক্ত বা পরাধীন স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। অনেক সময় পাশাপাশি একাধিক স্বরধ্বনি থাকায় যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে। বাংলাতে এই জাতীয় যৌগিক ধ্বনি

অনেক থাকলেও, মাত্র দুটি চিহ্ন বা বর্ণ পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। বর্ণ দুটি হলো ঐ এবং ঔ।

স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থানগত পরিমাপ-

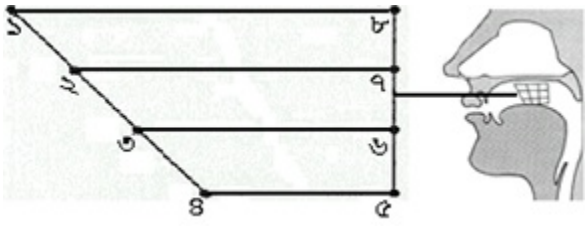

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কতটুকু সামনে বা পিছনে এলো, কিম্বা কতটুকু উপরে বা নিচে নেমে এলো তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। মুখের ভিতরে জিহ্বার অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষা বিজ্ঞানীরা একটি কৃত্রিম মানদণ্ড কল্পনা করে নিয়েছেন। এই মাপকাঠিটি trapezoid আকৃতির। এতে আনুভূমিক এবং সমান্তরাল চারটি রেখা রয়েছে। এর উপরে রেখাটি হলো তালুর প্রতীক এবং নিচের রেখাটি নিম্ন চোয়ালের ভিতর শায়িত জিহ্বার অবস্থানের প্রতীক। এর মাঝের দুটি রেখা জিহ্বার উত্থানের দাগাঙ্ক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আনুভূমিক রেখাগুলোকে প্রয়োজনানুসারে উলম্বভাবে বিভাজিত করা হয়। এই দাগাঙ্কের নিরিখে জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎ মান বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণের মৌলিকত্বের বিচারে জিহ্বার অবস্থানকে ৭টি অবস্থানে নির্দেশিত করা হয়। এই ৭টি অবস্থানের নিরিখে বর্ণগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। পাশের এই চিত্রের সামনের দিকের চারটি ও পিছনের চারটি বিন্দু দিয়ে ৮টি ধ্বনির অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই বিন্দুগুলির ভিতর ১,২,৩,৪ সংখ্যা বিন্দুতে অবস্থিত বর্ণগুলির ক্ষেত্রে জিহ্বা সামনের দিকে চাপ সৃষ্টি করে। একইভাবে পিছনের ৫, ৬, ৭, ৮ বিন্দুগুলো জিহ্বার পিছনের দিকে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে জিহ্বা উপরে বা নিচে, সামনে বা পিছনে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য নিচের ৪, ৫ বিন্দু দুটি আ ধ্বনির জন্য সাধারণ রেখা হিসাবে কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে স্বরবর্ণ উচ্চারণের জন্য জিহ্বার অবস্থানটা মূলত যে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে, তা হলো—

জিহ্বার অগ্র-পশ্চাত্গত অবস্থান

অপরটি জিহ্বার উত্থানগত অবস্থান।

জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎগত পরিমাপ

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় উচ্চারণভেদে জিহ্বা তালুর দিকে উত্তোলিত করা হয়। জিহ্বার এই গতি প্রকৃতি অনুসারে মৌলিক স্বরবর্ণগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হলো—

১. সম্মুখ : এক্ষেত্রে জিহ্বার সামনের দিকটা তালুর দিকে উত্থিত হবে। এই জাতীয় মৌলিক স্বরবর্ণগুলো হলো- ই, এ এবং এ্যা ।

২. পশ্চাৎ : এক্ষেত্রে জিহ্বার পিছনের দিকটা তালুর দিকে উত্থিত হবে। এই জাতীয় মৌলিক স্বরবর্ণগুলো হলো- উ, ও এবং অ।

৩. সমতল : এক্ষেত্রে জিহ্বার পুরো অংশটুকু নিম্নচোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে শায়িত থাকবে। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর ভিতরে একমাত্র আ ধ্বনিটি সমতলধর্মী।

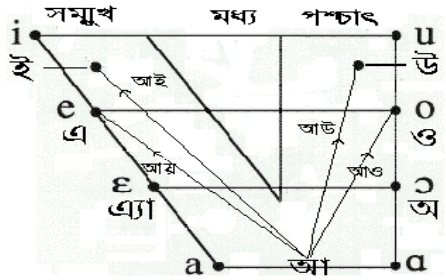

উপরের চিত্রে জিহ্বার গতিপ্রকৃতি অনুসারে মৌলিক স্বরবর্ণগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, এখানে ই এবং উ ধ্বনি দুটি ছকের একটু ভেতরে দেখানো হয়েছে। কারণ, ইংরেজি । ধ্বনির উচ্চারণ এবং বাংলা ই ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সামনের দিকে একই অবস্থানে যায় না। একই কারণ ঘটে ইংরেজি U ও বাংলা উ ধ্বনির ক্ষেত্রেও। সে কারণেই, ইংরেজি। ধ্বনি এবং বাংলা ই ধ্বনিটির উচ্চারণ এক নয়। একই কথা U ও উ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জিহ্বার উত্থানগত পরিমাপে স্বরবর্ণের পরিচয়

জিহ্বা তালুর দিকে উঠালে, তালু ও জিহ্বার মধ্যবর্তীস্থানের পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠে। এই সঙ্কীর্ণ স্থানের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে- মৌলিক স্বরবর্ণগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ চারটি হলো- সংবৃত, বিবৃত, অর্ধ-সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃত।

ক। সংবৃত (Close) : জিহ্বা তালুর কাছাকাছি এনে বায়ু চলাচলের জন্য একটি সঙ্কীর্ণ পথ তৈরি করা হয়। এই অবস্থায় উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে সংবৃত বলা হয়। তালু সংলগ্ন ধ্বনি হিসাবে এদেরকে তালব্য বর্ণ বলা হয়। এক্ষেত্রে ঠোঁট প্রসারিত থাকে। পাশের চিত্রে সংবৃত উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান দেখানো হলো। লক্ষ্য করুন, এখানে ই ধ্বনিটির জন্য জিহ্বার সম্মুখভাগ প্রায় তালু সংলগ্ন হয়েছে এবং উ ধ্বনিটির জন্য জিহ্বার পশ্চাত্ভাগ প্রায় পশ্চাৎ তালুর সংলগ্ন হয়েছে।

খ। বিবৃত (Open) : এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা ও তালুর ভিতর সব চেয়ে বেশি ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। মুখ প্রসারিত করে এই ফাঁকা জায়গার পরিমাণকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাতে এই জাতীয় স্বরবর্ণটি হলো আ। এক্ষেত্রে জিহ্বা স্বাভাবিকভাবে নিম্ন চোয়াল বরাবর শায়িত থাকবে। দীর্ঘ বা হ্রস্ব আ হিসাবে এর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আরবি ভাষার গলকক্ষ থেকে উচ্চারিত আ ধ্বনিটির ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসৃত হবে। কখনো কখনো জিহ্বার পশ্চাৎ অংশ ভিতরের দিকে সংকুচিত করে আ ধ্বনিটি উচ্চারণ করা হয়। এই ধ্বনিটিও বাংলাতে নেই। নিচের চিত্রে বিবৃত অবস্থায় আ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান দেখানো হল।

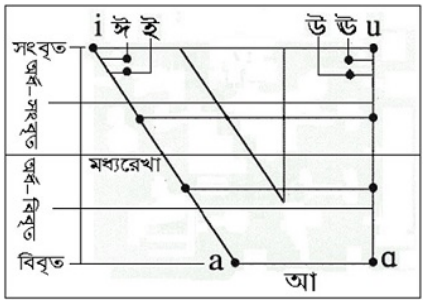

সংবৃত ও বিবৃত মধ্যরেখা

স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার উত্থানগত পরিমাপে আমরা দুটো চরম রেখা পেয়েছি। এর উপরের রেখাটি সংবৃত ও নিম্ন রেখাটি হলো বিবৃত। এবার এই দুটি চরম রেখার মধ্যভাগ দিয়ে যদি একটি আনুভূমিক রেখা টানি, তাহলে সংবৃত ও বিবৃত নামে দুটি অঞ্চল পাওয়া যাবে। পরের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে সংবৃত ও বিবৃত অঞ্চল বিভাজনকারী এই মধ্যরেখাকে দেখানো হয়েছে। মধ্যরেখা দ্বারা বিভাজিত এই দুটি অঞ্চল অনুসারে মৌলিক স্বরবর্ণের অন্যান্য বর্ণগুলোকে (সংবৃত ও বিবৃত ছাড়া) দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভাজিত করতে পারি। এক্ষেত্রে এই শ্রেণী দুটো হবে, অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি ও অর্ধ-বিবৃত ধ্বনি।

ক। অর্ধ-সংবৃত (half Close) : এই শ্রেণীর স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা মধ্যরেখাকে অতিক্রম করে সংবৃত অংশের কিছুটা অধিকার করবে। বাংলাতে এই শ্রেণীর দুটি ধ্বনি পাওয়া যায়। এই ধ্বনি দুটো হলো— এ এবং ও।

খ। অর্ধ-বিবৃত (half Open) : এই শ্রেণীর স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা মধ্যরেখাকে অতিক্রম না করে বিবৃত অংশের কিছুটা অধিকার করবে। বাংলাতে এই শ্রেণীর দুটি ধ্বনি পাওয়া যায়। এই ধ্বনি দুটো হলো- এ্যা এবং অ।

স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটের আকার

ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের আকৃতি কেমনতর হয়, সেটাও দেখার বিষয়। সাধারণত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা আবদ্ধ ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত করি বা পুরো প্রসারিত করি। অনেক সময় ঠোঁট দুটো গোলাকার হয়। স্বরধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠোঁটের আকৃতি কিরূপ হবে, তা ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

স্বাভাবিকভাবে বাইরে থেকে ঠোঁটের অবস্থা দেখে এর প্রকৃত আকার নির্ধারণ করতে গেলে, আমরা বিভ্রান্ত হবো। কারণ বাইরের দিক থেকে ঠোঁটকে যতটা প্রসারিত মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে ঠোঁটের ভিতরের দিকটা ততটা নাও প্রসারিত নাও হতে পারে। বিষয়টি আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ধরা যাক আপনি ই ধ্বনিটি উচ্চারণ করবেন। প্রথমে এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করে ঠোঁটকে স্থির রাখুন। এবার বাইরের দিক থেকে আঙুল স্পর্শ করে ঠোঁটের প্রসারণ লক্ষ করুন এবং একই সাথে ভিতর থেকে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে উভয় ঠোঁটের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান নির্ণয়ে চেষ্টা করুন। এই অবস্থায় আপনি যদি আয়নার ভিতর দিয়ে আপনার ঠোঁটের আকার লক্ষ্য করেন, তা হলে সব মিলিয়ে আপনি বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারেন। ঠোঁটের বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তার প্রধান দুটি কারণ-

১. ঠোঁটের ভিতরের অংশ বাইরে থেকে ভালো ভাবে দেখা যায় না।
২. ব্যক্তি বিশেষে ঠোঁট মোটা বা পাতলা হতে পারে। সাধারণত মোটা বা মাংসল ঠোঁটের ভিতরের অংশ বেশি ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ই ধ্বনির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করার জন্য মোটা ঠোঁটের অধিকারীরা ঠোঁট দুটো অপেক্ষাকৃত বেশি প্রসারিত করেন।
যা হোক স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট গোল করা হবে, না স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হবে- তা নির্ভর করবে, কোন স্বরধ্বনিটি উচ্চারিত হবে তার উপর। এই অবস্থার বিচারে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটের আকার পরিবর্তনকে- প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই ভাগ দুটি হলো-

ক. স্বাভাবিক প্রসারিত বা অগোলকৃত (Spread/Unrounded) : ঠোঁট দুটিকে একটু উন্মুক্ত করে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। এক্ষেত্রে স্বভাবিকভাবে ঠোঁট যেভাবে থাকে তার চেয়ে বেশি করে দুই দিকে প্রসারিত করা হয় না। প্রসারণ যা ঘটে তা হলো ঠোঁটের উপর-নিচ বরাবর। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় ধ্বনিগুলোর ভিতর রয়েছে ই, এ, এ্যা, আ।

দেখা যায় প্রসারণের বিচারে দেখা যায়- ই উচ্চারণের সময় ঠোঁট দুটোর প্রসারণ অপেক্ষাকৃত কম। এ ধ্বনিটি উচ্চারণর সময় ই অপেক্ষা একটু বেশি ঠোঁট ফাঁক করতে হয়। আবার এ্যা ধ্বনিটির ক্ষেত্রে এই প্রসারণের পরিমাণ এ অপেক্ষা বেশি। সর্বশেষ আ ধ্বনিটর ক্ষেত্রে প্রসারণের পরিমাণ হয়ে থাকে সর্বাধিক। এই বিচারে এই ৪টি ধ্বনি উচ্চারণের ক্রমমান হলো- ই <এ <এ্যা <আ

নিচের চিত্রে ই এবং আ ধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটের যে আকার সৃষ্ট হয়, তার নমুনা দেখানো হলো

ই

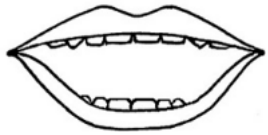

আ

খ। বর্তুলাকার (Rounded) : এক্ষেত্রে ঠোঁট দুটিকে একটু উন্মুক্ত করে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় ধ্বনিগুলো হলো-অ, ও এবং উ।

বর্তুলাকার স্বরধ্বনিগুলোর ভিতর অ-ধ্বনিটির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঠোঁট দুটো বড় ধরনের গোলাকার অবস্থায় পৌঁছায়। মাঝারি ধরনের গোলাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়- ও-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু উ উচ্চারণের সময়, ঠোঁট দুটো গোলাকার হয়ে সর্বোচ্চ সঙ্কোচন মাত্রায় পৌঁছায়। এই বিচারে এই ৩টি ধ্বনি উচ্চারণের ক্রমমান হলো- অ >ও>উ।

নিচের চিত্রে উ এবং অ ধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁটের যে আকার সৃষ্ট হয়, তার নমুনা দেখানো হলো

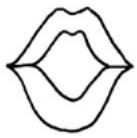

অ

উ(ঊ)

স্বরবর্ণের নাসিক্য ও সানুনাসিক গুণ

স্বরবর্ণের সাথে নাসিক্য ধ্বনি যুক্ত করার সময়, আমরা আল্‌জিহ্বা ও কোমল তালু জিহ্বামূলে পুরোপুরি নামিয়ে আনি না। সেই কারণে, স্বরবর্ণ নাসিক্য না হয়ে সানুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized vowel) হয়। এই নিয়মে স্বরধ্বনিগুলোকে লিখা যেতে পারে অঁ, আঁ ইত্যাদি রূপে। কিন্তু ম, ণ ও ন এর সাথে যুক্ত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় উচ্চারিত অ ধ্বনিটি নাসিক্য স্বরবর্ণে পরিণত হয়। আবার এর সাথে অন্য কোন স্বরবর্ণ যুক্ত হলে, উক্ত স্বরবর্ণটি সানুনাসিক হয়ে যায়। যেমন- মা। এখান ম ধ্বনিটি নাসিক্য। কিন্তু যখন মা ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়, তখন এর সাথের আঁ ধ্বনিটি (ম + আঁ) সানুনাসিক হয়ে যায়। এই কারণে একে বলা হয় সানুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি।

বাংলা ভাষায় স্বীকৃত মৌলিক ধ্বনিগুলোর প্রকৃতি

অ {স্বরধ্বনি, মৌলিক, বিবৃত-মধ্য, পশ্চাৎ, অবর্তুলাকার}

ও {স্বরধ্বনি, মৌলিক, সংবৃত-মধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুলাকার}

আ {স্বরধ্বনি, মৌলিক, বিবৃত, সমতল, অবর্তুলাকার}

ই (ঈ) {স্বরধ্বনি, মৌলিক, সংবৃত, সম্মুখ, অবর্তুলাকার}

উ (ঊ) {স্বরধ্বনি, মৌলিক, সংবৃত, পশ্চাৎ, বর্তুলাকার}

এ {স্বরধ্বনি, মৌলিক, সংবৃত-মধ্য, সম্মুখ, অবর্তুলাকার}

এ্যা {স্বরধ্বনি, মৌলিক, বিবৃত-মধ্য, সম্মুখ, অবর্তুলাকার}

একাধিক স্বরধ্বনি এক ধাক্কায় উচ্চারিত হওয়ার সূত্রে যৌগিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে। বাংলাতে যৌগিক স্বরধ্বনির ব্যবহার প্রচুর।

যৌগিক স্বরধ্বনি : একসঙ্গে উচ্চারিত দুটি স্বরধ্বনির একেকটি গুচ্ছকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনির অন্যান্য নাম হলো- সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর, দ্বিস্বর, যুগ্মস্বর। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি ২টি- ঐ, ঔ। তবে বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে সরাসরি কোথাও না কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয়, সে সকল ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। কোন স্বরধ্বনি যুক্ত না করে, ব্যঞ্জনধ্বনি পৃথকভাবে সরাসরি উচ্চারণ করা যায় না। বাংলাতে এর সাথে অ ধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণযোগ্য করা হয়। যেমন : ক্ খ্ গ্ ইত্যাদি। পৃথকভাবে উচ্চারণযোগ্য নয়, কিন্তু এর সাথে অ ধ্বনি যুক্ত করে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণ করা হয়। এই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো লিখার জন্য যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তার প্রত্যেকটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। এগুলো হলো— ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঠ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, য়, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ।

প্রচলিত ব্যাকরণ বইগুলোতে ৎ-কে পৃথক ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ধরা হয় ৩৯টি। প্রকৃতপক্ষে ৎ পৃথক কোন ধ্বনি নয়। এটি ত-এর রুদ্ধ ধ্বনি-সঙ্কেত মাত্র। উল্লেখ্য বর্তমানে ইউনিকোডে-ও ৎ-কে পৃথক সঙ্কেতের অধীনে আনা হয়েছে।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির ধ্বনিস্থান অনুসারে উচ্চারণ প্রকৃতি

উচ্চারণের প্রকৃতি ও স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কয়েকটি গোত্রে বিভাজিত করা হয়ে থাকে। এই ভাগগুলো হলো—

বর্গীয়ধ্বনি :

বাংলা ভাষার প্রাচীন ব্যাকরণবিদরা এই বর্গগুলোর সাথে উচ্চারণস্থান যুক্ত করে এর ভিন্নতর নাম দিয়েছিলেন এবং আজও তা অনেকেই নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে চলেছেন। গোড়া থেকেই পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করায়, বর্গের এই উচ্চারণস্থান ভিত্তিক নামকরণটি বাংলাতে অবিকৃতভাবেই স্থান লাভ করেছে। কিন্তু অন্ধের মতো সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে, আমাদের কতটা যে অসত্যের দিকে পরিচালিত করা হয়েছে, তা একটু বিবেচনা করলেই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখ্য পাণিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকের ব্যাকরণবিদ। সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ রীতি যেমনটা ছিল, সে সূত্রে পাণিনির মতামত হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু প্রাকৃত ভাষার দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ধারায়, পাণিনির সংস্কৃতের সাথে বাংলা ধ্বনির গড়মিল হওয়াটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে যাঁরা সংস্কৃত চর্চা করেন, তাঁদের সংস্কৃত উচ্চারণ হয়তো কিছুটা বিকৃত হয়েছে, কিন্তু এই উচ্চারণও যে আধুনিক কালের প্রমিত বাংলার মতো নয়, তা কিন্তু বুঝা যায়।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম ২৫টি বর্ণকে (ক থেকে ম) উচ্চারণের প্রকৃতি অনুসারে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি বর্গের প্রথম বর্ণানুসার বর্গের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—

ক বর্গ: এটি বর্গীয় বর্ণের প্রথম ভাগ। পাণিনিকে অনুসরণ করে বাংলা ব্যাকরণে এর নামকরণ করা হয়েছে কণ্ঠ্যধ্বনি। কিন্তু এই বর্গের ধ্বনিগুলো কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় না। এর উচ্চারণস্থান কোমল তালু বা স্নিগ্ধ তালু। তাই বর্তমানে এই বর্গের ধ্বনিগুলোর ভিতর ক, খ, গ, ঘ নামকরণ করা হয় কোমল তালুজাত বা স্নিগ্ধ তালব্য বর্ণ। এর ঙ ধ্বনিটি নাসিক্য।

চ বর্গ: এটি বর্গীয় বর্ণের দ্বিতীয় ভাগ। প্রাচীন ব্যাকরণবিদদের মতে, এটি তালব্য বর্ণ। মূলত এগুলোকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলাটাই উচিৎ। এই বর্গের চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনিগুলো প্রশস্ত দন্তমূলীয়। এই বর্গের ঞ স্বাধীনভাবে সানুনাসিক স্বরবর্ণের মতো হলেও, হসন্ত যুক্ত ঞ্ হয় ন-এর মতো।

ট বর্গ: এটি বর্গীয় বর্ণের তৃতীয় ভাগ। এই ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্ঠিত ধ্বনি বলা হয়। এর অন্য নাম মূর্ধন্যজাত ধ্বনি। এই বর্গের সকল ধ্বনিই একই নিয়মে উচ্চারিত হয়।

ত বর্গ : এটি বর্গীয় বর্ণের চতুর্থ ভাগ। এই ধ্বনিগুলো দন্ত্যধ্বনি নামে পরিচিত। এর শেষ বর্ণ ন, নাসিক্যধর্মী। স্বাধীনভাবে ন দন্তমূলীয়। তবে ত, থ, দ, ধ-এর সাথে ন যুক্ত হলে, তা দন্ত্য বর্ণ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

প বর্গ : এটি বর্গীয় বর্ণের পঞ্চম ভাগ। এই ধ্বনিগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামে পরিচিত। কিন্তু ওষ্ঠ ও অধরের সম্মিলনে তৈরি হয় বলে আমি একে ওষ্ঠাধর ধ্বনি বলেছি। এর ম ধ্বনিটি নাসিক্য।

উল্লেখ্য ধ্বনি-প্রকৃতি অনুসারে এই ২৫টি বর্ণই প্রতিহত ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি। এছাড়া

অন্তঃস্থ ধ্বনি: বর্গীয় ২৫টি বর্গীয় ধ্বনির পরের চারটি ধ্বনিগুলো অন্তস্থ ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো - য (য়)। সংস্কৃতিতে য-এর উচ্চারণ ছিল ইঅ। পরে প্রাকৃত ভাষায় এবং সেই সূত্রে বাংলাতে এর উচ্চারণের রূপ দাঁড়িয়েছে জ। য-জাত ইঅ ধ্বনিকে বাংলাতে প্রকাশ করার জন্য য়-এর সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় য, র, ল-এর পরে ব ধ্বনি রয়েছে। এর উচ্চারণ ছিল ওয়া-এর মতো। বাংলাতে ব-ফলা হিসাবে এর ব্যবহার থাকলে, স্বাধীনভাবে এটি উচ্চারিত হয় না। বাংলা বর্ণমালায় এর জন্য কোন পৃথক চিহ্ন নেই।

কম্পিত ধ্বনি: ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বের হওয়ার সময়, যদি জিহ্বা বা আলজিহ্বা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কম্পনের সৃষ্টি করে, তা হলে তাকে কম্পিত ধ্বনি বলা হয়। বাংলাতে র ধ্বনিটি কম্পিত ধ্বনি। অন্তঃস্থ ধ্বনির পরেই র-এর অবস্থান।

পার্শ্বিক ধ্বনি: ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়, জিহ্বার অগ্রভাগ তালু অংশের দিকে স্পর্শ করে বাধা প্রদান করলে, বাতাস জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় হঠাৎ করে জিহ্বার ডগা উপরের অংশ থেকে সরিয়ে নিলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকেই পার্শ্বিক ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় ধ্বনি হলো ল। এটি তরল ধ্বনি নামেও চিহ্নিত করা হয়।

উষ্ম-ধ্বনি: ফুসফুস থেকে শ্বাস বেরিয়ে যাবার পথ কোথাও সঙ্কুচিত করার কারণে, বাতাসে এক ধরনের শিস্ জাতীয় শব্দের সৃষ্টি হয়। সাপের শ্বাস ছাড়ার মতো এই ধ্বনিকে ইংরেজিতে বলা হয় হিস্‌হিস শব্দ (hissing sound)। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এর নামকরণ করেছিলেন আশ্রয়ী (Spirant) বা শিস্ ধ্বনি (Sibilant) হিসাবে। শ্বাসের ঘর্ষণজাত প্রক্রিয়ায় উত্পন্ন শিস্ জাতীয় ধ্বনি উষ্ম (নিঃশ্বাস) ধ্বনি বলা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় ধ্বনিগুলো হলো- শ, ষ, স, হ।

তাড়নজাত: জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর দিকে উঠিয়ে একটি বারের তাড়নায় এই ধ্বনি তৈরি করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় দুটি রয়েছে। ধ্বনি দুটি হলো- ড এবং ঢ়।

পরাশ্রয়ী: এই বর্ণের ধ্বনুগুলো অন্য বর্ণের আশ্রয়ে উপস্থাপিত হয়। বাংলাতে এই জাতীয় বর্ণ দুটি রয়েছে। এই বর্ণ দুটি হলো ঃ এবং ঁ।

অবশিষ্ট বর্ণ:

ং হলো ঙ-এর বিকল্প ধ্বনি।

ৎ, ত-এর হসন্তযুক্ত রূপ।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ অ-কার ব্যতীত স্বরবর্ণের অন্যান্য কারচিহ্নের সাথে বসে। এছাড়া দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে যুক্ত বর্ণ তৈরি করে।

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে সরাসরি কোথাও না কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয়, সে সকল ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। কোন স্বরধ্বনি যুক্ত না করে, ব্যঞ্জনধ্বনি পৃথকভাবে সরাসরি উচ্চারণ করা যায় না। বাংলাতে এর সাথে অ ধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণযোগ্য করা হয়। যেমন :

ক্ +অ=ক

খ্ +অ=খ

গ্ +অ=গ ইত্যাদি

এই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো লিখার জন্য যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তার প্রত্যেকটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)বলা হয়। প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ অ-ধ্বনিকে সহযোগী করে উচ্চারিত হয়, সে কারণে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বাধীনভাবে হসন্তহীন দশায়

উপস্থাপিত করা হয়। যেমন— ক, খ, গ ইত্যাদি। দেখুন : ব্যঞ্জনবর্ণ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণী বিভাজন

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণের শর্তাবলী নির্ভর করে, এর উচ্চারণগত প্রকৃতি এবং বাগ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারবিধির উপর। আবার ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাতাস। উল্লেখ্য মানুষ তার বাগ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাতাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বনি সৃষ্টি করে। সার্বিক বিচারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায় ভাগগুলো হলো–

১ . ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান

২. ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি

উপরের দুটি বিষয় অনুসারে, বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একটি সাধারণ শ্রেণিকরণে ফেলা যায়। এই শ্রেণিকরণ মূলত অন্যান্য ভাষার সাথে সমন্বয় করা যায় সহজে। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনিরূপের স্বকীয়তার বিচারে আরও একটি বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। মূলত বর্ণের এই শ্রেণিকরণ করা হয় পাণিনীয় ধ্বনি বিন্যাসের সূত্রে। একথা অবশ্যই মানতে হয় যে, বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃত মতো নয়, কিন্তু শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে পাণিনীয় ধ্বনি বিন্যাসকেই বিবেচনায় রাখা হয়। যেমন: বর্গীয় ধ্বনি

১ . বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান -

১.১. স্বরতন্ত্রী থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত অংশ

১.২. কোমল তালু থেকে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত

১.২.১. অধরস্থ ধ্বনি

১.২.১.১.ওষ্ঠাধর ধ্বনি

১.২.১.২. দন্ত্যাধর

১.২.২. জিহ্বা-স্পর্শিত ধ্বনি

১.২.২.১. পশ্চাৎ-জিহ্বাজাত ধ্বনি

১.২.২.২. জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি

১.২.২.২.১. প্রশস্ত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি ও তালব্য ধ্বনি

১.২.২.২.২. অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি

১.২.২.২.৩. দন্ত্য

১.২.২.২.৪. দন্ত্যমূলীয়

১.২.২.২.৪.১. প্রকৃত দন্ত্যমূলীয়
১.২.২.২.৪.২. উত্তর দন্ত্যমূলীয়
১.২.২.২.৪.৩. দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত

১. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান

বাগ্-প্রত্যঙ্গের বাধাজনিত কারণে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই বাধার কাজগুলো করে থাকে, স্বরতন্ত্রী, স্বরপথ, গলকক্ষ, আলজিহ্বা, জিহ্বা, কোমল তালু থেকে উপরের পাটি দাঁত পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ ও ওষ্ঠাধর। উচ্চারণের স্থান হিসাবে আমরা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থানগুলোকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই ভাগ দুটি হলো—

১.১. স্বরতন্ত্রী থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত অংশ : এই অংশের ভিতর বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি হিসাবে স্বরতন্ত্রী জাত ধ্বনি পাওয়া যায় হ এবং ঃ। এই অংশের স্বরপথ ও আলজিহ্বা থেকে উৎপন্ন ধ্বনি বাংলাতে নেই।

১.২. কোমল তালু থেকে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত : বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির অধিকাংশই উচ্চারিত হয়, আলজিহ্বা সংলগ্ন কোমল তালু থেকে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের ভিতরে। এই অংশের উচ্চারিত ধ্বনিগুলো সাধারণভাবে স্পর্শধ্বনি (Plosive) হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য স্পর্শধ্বনিকে বিবেচনা করা হয় ফুসফুস পরিচালিত বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনির প্রতিহত শ্রেণী হিসাবে।

বাগ্‌প্রত্যঙ্গের স্পর্শ-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে স্পর্শ ধ্বনিকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগ দুটি হলো— অধরস্থ ধ্বনি ও জিহ্বা-স্পর্শিত ধ্বনি।

১.২.১. অধরস্থ ধ্বনি

মানুষের ঠোঁটকে উপর-নিচের অবস্থান অনুসারে দুটি নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এর উপরের অংশের নাম ওষ্ঠ ও নিচের অংশের নাম অধর। এই অধরের সাথে কখনো উপরের পাটির দাঁতের সামনের কয়েকটি দাঁত স্পর্শ করে বা ওষ্ঠ অধরকে স্পর্শ করে। এই স্পর্শের ধরন অনুসারে অধরস্থ ধ্বনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগ দুটো হলো- ওষ্ঠাধর ধ্বনি ও দন্ত্যাধর ধ্বনি।

১.২.১.১.ওষ্ঠাধর ধ্বনি :

বাংলা ব্যাকরণে এই জাতীয় ধ্বনিকে ওষ্ঠ্যধর-ধ্বনি বলা হয়। এই ধ্বনি ওষ্ঠ ও অধরের স্পর্শে উচ্চারিত হয়। সেই বিচারে একে ওষ্ঠাধর ধ্বনি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের সময়, প্রথমে ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে ধরা হয় এবং পরে হঠাৎ ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁকা করে একটু ধাক্কা দিয়ে বাতাস বের করে দেওয়া হয়। এ সকল বর্ণ উচ্চারণের সময় যখন ঠোঁট দুটো একত্রিত করা হয়, তখনই স্বরতন্ত্রী ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু ঠোঁট বন্ধ থাকার কারণে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হতে পারে না। যে মুহূর্তে ভিতরের দিকে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করে ঠোঁট দুটো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তখনই এর সাথে স্বরতন্ত্রীজাত স্বরবর্ণ যুক্ত করে দেওয়া হয়। স্বরতন্ত্রী ও ওষ্ঠাধরের যুগপৎ ক্রিয়ায় সৃষ্ট ধ্বনিটি অধর ও ওষ্ঠের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই জাতীয় বাংলা ধ্বনিগুলো হলো- প, ফ, ব, ভ, ম।

১.২.১.২. দন্ত্যাধর :

প্রচলিত বাংলা ব্যকরণে একে দন্তৌষ্ঠ বর্ণ বলেন বটে, কিন্তু এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে উপরের পাটির দাঁত দ্বারা অধর স্পর্শ করা হয়। তবে এই সময় ওষ্ঠ উপরের দিকে তুলে ধরে রাখা হয়। এই অবস্থায় দন্ত ও অধরের মধ্যে সামান্য ফাঁক সৃষ্টি করে বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। সেই কারণে আমি এর নাম দন্তাধর রাখার পক্ষপাতি। স্বাভাবিকভাবে বাংলা বর্ণগুলোর কোনটিই এই ভাবে উচ্চারণ করা হয় না। ইংরেজি ভাষায় এর উদাহরণ হলো- f, v। বাংলাভাষায় কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণ এরূপ পৃথকভাবে উচ্চারিত না হলেও, হ্ব যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন : জিহ্বা। বাংলা বানানে এর উচ্চারণ লিখতে গেলে লিখা উচিত্ জিওvআ বা জিউvআ। কারণ এই v বাংলা ভ নয়। এই জাতীয় অন্যান্য শব্দগুলো হলো- আহ্বান, বিহ্বল, গহ্বর ইত্যাদি।

১.২.২. জিহ্বা-স্পর্শিত ধ্বনি

জিহ্বার প্রত্যক্ষ ব্যবহারে উচ্চারিত বর্ণগুলোর সাধারণ নাম হিসাবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জিহ্বার পশ্চাৎ অংশ বা অগ্রভাগ দ্বারা তালু, দন্তমূল, দন্ত ইত্যাদি স্পর্শ করে ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। বর্গীয় ধ্বনির ভিতর স্বাধীন 'ঞ' পুরোপুরি স্পর্শ না হলেও যুক্ত 'ঞ' জিহ্বা-স্পর্শিত। ব্যঞ্জনধ্বনির ভিতর প বর্গের সকল ধ্বনি, স, হ, ঃ এবং ঁ জিহ্বা-স্পর্শিত হয়ে উচ্চারিত হয় না। জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনায় একে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই ভাগ দুটো হলো—

১.২.২.১. পশ্চাৎ-জিহ্বাজাত ধ্বনি :

জিহ্বার পিছনের অংশটি কোমল তালুর শেষের দিকে স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। বর্গীয় ধ্বনিগুলোর ভিতর একমাত্র ক-বর্গের ধ্বনিগুলোই এই শ্রেণীর ভিতর ধরা হয়। পূর্বে ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে কণ্ঠ্যধ্বনি বলা হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলো কণ্ঠ্যধ্বনি নয়। সাধারণত নরম তালুর পশ্চাৎ দিকের অংশ থেকে গ্লটিস পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ থেকে উৎপন্ন ধ্বনিগুলোকে সাধারণভাবে কণ্ঠ্যধ্বনি বলা হয়। উৎপত্তির স্থান বিবেচনায় কণ্ঠ্যধ্বনিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ তিনটি হলো—

আল্‌জিহ্বাজাত ধ্বনি, গলকক্ষীয় ধ্বনি ও স্বরপথ স্পর্শ ধ্বনি। আলজিহ্বাজাত ধ্বনি (Uvular) আলজিহ্বাকে কম্পিত

করে সৃষ্টি করা হয়। ডাচ্-জার্মান ও ফরাসী 'র' এ-ভাবে উচ্চারিত হয়। সে জন্য এ ভাষাগুলোর 'র' ধ্বনির নাম Uvula 'র'। গলকক্ষ সঙ্কুচিত করে গলকক্ষীয় ধ্বনি সৃষ্টি হয়। আরবী কাফ ধ্বনি গলকক্ষীয় ধ্বনির উদাহরণ। স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী স্বরপথ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে এক ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় স্বরপথ-স্পর্শীয় (Glottal)ধ্বনি । এর সঙ্কেত (?)। জার্মান ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে।

ক-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণ হয় কোমল তালু থেকে, তাই এর নামকরণ করা হয়- কোমল তালুজাত বা স্নিগ্ধতালব্য ধ্বনি (Velar)। এই ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে, প্রথমে কোমল তালুতে জিহ্বার পশ্চাত্ অংশ যুক্ত করে শ্বাস রোধ করা হয়। পরে এই অবরোধ তুলে স্বরবর্ণযুক্ত করে এই ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই জাতীয় ধ্বনি।

১.২.২.২. জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি :

জিহ্বার অগ্রভাগ (Apex) শিখার মতো উপরে উঠিয়ে, স্বরতন্ত্রীকে বাধা দিয়ে এই ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দাঁত, মাড়ি (দন্ত্যমূল), মূর্ধা, তালু স্পর্শ করার প্রক্রিয়ায় জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনির উৎপত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে জিহ্বার অগ্রভাগ উক্ত স্থানগুলোর কোথায় স্পর্শ করবে, তার উপর ভিত্তি করে ধ্বনির ধর্ম বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণীর ধ্বনিগুলোকে ৪টি উপভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগগুলো হলো—

১.২.২.২.১. প্রশস্ত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি ও তালব্য ধ্বনি :

বাংলাতে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বা-ফলক ও জিহ্বার অগ্রভাগ একই সাথে শক্ত তালু ও দন্তমূল স্পর্শ করে। সেই কারণে মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে একে প্রশস্ত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি নামে অভিহিত করেছেন। রামেশ্বর শ একে বলেছেন তালুদন্তমূলীয়। কিন্তু জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁত স্পর্শ করে জিহ্বা-ফলককে দন্তমূলে স্থাপন করেও চ, ছ, জ, ঝ উচ্চারণ করা হয়। প্রচলিত ব্যাকরণ বইতে এই জাতীয় ধ্বনিকে তালব্য (Palatal) নামে পরিচয় দেওয়া হয়। [দ্রষ্টব্য : আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে বাংলা উচ্চারণ]।

এই বর্গের ভিতর ঞ উচ্চারণটি সানুনাসিক বর্ণ। উচ্চারণের দিক থেকে এটি যৌগিক স্বরবর্ণের মতো (ইঁয়ঁ)। যুক্তবর্ণ হিসাবে এর উচ্চারণ হয় দন্ত্য-ন এর মতো। অঞ্জন =অ-ঞ্+জ-ন। এর উচ্চারণ- অন্‌জন। তালব্য বর্গের বাইরের ধ্বনি শ -কে তালুজাত ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হলেও কখনো কখনো কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা দন্ত্য-বর্ণে রূপ লাভ করে থাকে। পরের পাঠে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২.২.২.২. অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি :

দুই পাটি দাঁতের মাঝে জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনির উচ্চারণ করা হয়। যেমন- গ্রীক q । বাংলা বর্ণমালায় এই উচ্চারণ পাওয়া যায় না।

১.২.২.২.৩. দন্ত্য :

উপরের দাঁতে জিহ্বার অগ্রভাগ স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। বাংলা বর্ণগুলোর ভিতর এই জাতীয় বর্ণগুলো হলো-ত, থ, দ, ধ। বাংলা ব্যাকরণে অনেকে দন্ত্য বর্ণ হিসাবে ন কে উল্লেখ করেন। মূলত ন হলো দন্তমূলীয় বর্ণ।

১.২.২.২.৪.দন্ত্যমূলীয় :

জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। বাংলা বর্ণমালায় এই জাতীয় বর্ণগুলো হলো- ন, র, ল। এই ধ্বনিগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি বিভাজন করা হয়। যেমন—

১.২.২.২.৪.১. প্রকৃত দন্ত্যমূলীয় :

দন্তমূলে অগ্রজিহ্বা স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় বর্ণগুলো হলো- ন, য, র, ল, স। যুক্তবর্ণ হিসাবে উচ্চারিত বর্ণগুলো হলো হ্ন, হ্ল, হ্ন।

১.২.২.২.৪.২. উত্তর দন্ত্যমূলীয় :

দন্তমূলের পিছনের দিকের শক্ততালুর কাছাকাছি অংশ পর্যন্ত স্পর্শ দন্ত্যমূলের অঞ্চল। জিহ্বার অগ্রভাগ উঁচু করে এই অংশ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকে উত্তর দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি বলা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় বর্ণ হিসাবে শ-কে বিবেচনা করা হলেও, এই ধ্বনিটি উচ্চারণে জিহ্বা উত্তর দন্ত্যমূলকে পুরোপুরি স্পর্শ করে না। তবে এক্ষেত্রে উত্তর দন্ত্যমূল বরাবর জিহ্বার অগ্রভাগ সামান্য স্পর্শ পায় মাত্র। এই সামান্য স্পর্শ ছাড়াই শ উচ্চারণ করে থাকেন।

১.২.২.২.৪.৩. দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত :

জিহ্বার অগ্রভাগ একটু বেশি বাঁকিয়ে মাড়ির শেষাংশের শক্ততালুর কাছাকাছি স্থান স্পর্শ করে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। মূর্ধা অঞ্চল থেকে উচ্চারিত ধ্বনি হিসাবে এগুলোকে মূর্ধন্য হিসাবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাংলাতে এই জাতীয় বর্ণগুলো হলো- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ড়, ঢ়, ষ। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষায় এই ধ্বনিগুলো যে ভাবে উচ্চারিত হয়, তা মূর্ধন্য নয়। এক্ষেত্রে এর উচ্চারণের স্থান শক্ততালুর শুরুতে। রামেশ্বর শ একে প্রাক্-শক্ততালব্য (Apico-prepalatal) হিসাবে চিহ্নিত করাকে উচিৎ বলে বিবেচনা করেছেন।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি

মানুষ বাগ্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনি তৈরি করে বটে, কিন্তু এতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বাতাস। আর এই বাতাসের প্রবাহকে কার্যকরী করে ফুসফুস। এক্ষেত্রে ধ্বনি উৎপন্ন হতে পারে ফুসফুস দ্বারা তাড়িত বহির্গামী বায়ু প্রবাহ দ্বারা, কিম্বা ফুসফুসের সাথে ঊর্ধ্ব-কণ্ঠের বায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের দ্বারা।

ফুসফুসের বাতাস স্বরতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং এর সাহায্যেই ধ্বনি তৈরি হয়। এই উৎপন্ন ধ্বনিসমূহ অন্যান্য বাগ্-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। এই সাধিত ধ্বনিগুণের বৈচিত্র্যতার ভিতর দিয়েই উৎপন্ন ধ্বনিসমূহের পার্থক্য নিরুপিত হয়। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে বাগ্-প্রত্যঙ্গের বাধা হয় আংশিক, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ঘটে সম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণের মতো। ফুসফুসের চাপে মুখবিবরের দিকে প্রবাহিত বাতাসে বাধা সৃষ্টি করে যে ধ্বনি তৈরি করা হয়, তার সাধারণ নাম— ফুসফুস পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Pulmonic Airstream Sound)। পক্ষান্তরে কিছু ধ্বনি তৈরি করা হয়— ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহের দ্বারা। স্বভাবতই এই ধ্বনিগুলিকে বলা হয়- ফুসফুস বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Non-Pulmonic Airstream Sound)। ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্নের ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহের দুটি ধরনই ব্যবহৃত হয়। তবে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলোতে এ দুটির ফুসফুস পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। যা হোক, ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই বিভাজনটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এর ফলে নূতন যে বিভাজিত রূপটি দাঁড়ায় তা নিচের ছকের মতো।

১ . ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি

১.১. ফুসফুস পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি

১.১.১. প্রতিহত ধ্বনি

১.১.২. প্রবাহী ধ্বনি

১.১.১.১. নাসিক্য
১.১.১.২. সানুনাসিক
১.১.১.৩. মৌখিক
১.১.১.৩.১. কম্পিত ধ্বনি
১.১.১.৩.২. তাড়নজাত ধ্বনি
১.১.১.৩.৩. উষ্ম ধ্বনি
১.১.১.৩.৪. পার্শ্বিক ধ্বনি

১.১.৩. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি
১.১.৩.১. অল্পপ্রাণ
১.১.৩.২. মহাপ্রাণ

১.১.৪. ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি
১.১.৪.১. ঘোষ ধ্বনি
১.১.৪.২. অঘোষ ধ্বনি

১.১.৫. ঘৃষ্টধ্বনি

১.১.৬. অর্ধ-স্বর

১.২. ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি

১.২.১. রুদ্ধ-স্বরপথ-চালিত বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি
১.২.১.১. বহিঃস্ফোটক ধ্বনি
১.২.১.২. অন্তঃস্ফোটক ধ্বনি

১.২.২.স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহজাত ধ্বনি
১.২.২.১. ওষ্ঠাধর শীৎকার
১.২.২.২. দন্ত্য শীৎকার
১.২.২.৩. উত্তর দন্ত্যমূলীয় শীৎকার
১.২.২.৪. তালুদন্তমূলীয় শীৎকার
১.২.২.৫. দন্ত্যমূলীয় পার্শ্বিক শীৎকার
১.২.২.৬. শিস্‌ধর্মী শীৎকার
১.২.২.৭. স্বরতন্ত্রী শীৎকার

১ . ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি

১.১. ফুসফুস পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি

ফুসফুস পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনিগুলোর বায়ু প্রবাহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ দুটি হলো- প্রতিহত (Stop) ধ্বনি ও প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি। আলোচনার সূত্রে উচ্চারণ এই জাতীয় ধ্বনির যে প্রাথমিক বিভাজন পাই তা হলো—

১.১.১. প্রতিহত ধ্বনি : এই জাতীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে বাগ্-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারণ স্থানে বায়ুপ্রবাহ কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ থামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এই সময় কোন ধ্বনি তৈরি হয় না। এরপর হঠাৎ করে এই বাধা উঠিয়ে ফুসফুসের বাতাসকে ধাক্কা দিয়ে মুখের বাইরে দিকে সঞ্চালিত করা হয়।

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে এই জাতীয় ধ্বনিগুলোকে বলা হয় স্পর্শ ধ্বনি। এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নাম Plosive । বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিমালায় বর্গীয় ধ্বনি হিসাবে এর সংখ্যা ২০টি। এগুলো হলো- ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, এবং ভ। এছাড়া য ধ্বনিটি প্রতিহত ধ্বনি। র, ল, শ, ষ, হ, ইত্যাদি স্পর্শ ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হলেও, এগুলো প্রতিহত নয়। এই ধ্বনিগুলো সব সময় মুখবিবর দিয়ে প্রকাশ পায়। আবার নাক দিয়ে সঞ্চালিত ধ্বনি প্রতিহত হয় না। সেই কারণে নাসিক্য ও সানুনাসিক ধ্বনি প্রতিহত নয়।

১.১.২. প্রবাহী ধ্বনি : এই সকল ধ্বনি বাগ্প্রত্যঙ্গ স্পর্শিত হয়ে বাতাসকে বাধা দেয় বটে, কিন্তু বিকল্পপথে বায়ু প্রবাহের কারণে ধ্বনি সম্পূর্ণ থেমে যায় না। এর ফলে উত্পন্ন ধ্বনির আংশিক রূপ পাওয়া যায়। যেমন ম ধ্বনিটি। ঠোঁট বন্ধ করে ম ধ্বনি উচ্চারণের চেষ্টা করলে, ধ্বনির একটি অংশিতরূপ নাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং তা অবিচ্ছিন্নভাবে চালিত করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় হঠাৎ করে, রুদ্ধ বাগ্প্রত্যঙ্গ উন্মুক্ত করে দিলে, ধ্বনিটি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে।

১. নাসিক্য (Nasal) : শুধুমাত্র নাক দিয়ে ধ্বনি প্রবাহিত হবে। এই জাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো হলো- ঙ, ঞ, ন, ণ, ম, ং।

২. সানুনাসিক (Nasalized) : যে সকল ধ্বনি নাক ও মুখ দিয়ে বিভাজিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এর পূর্ণনাম সানুনাসিক ব্যঞ্জনবর্ণ (Nasalized consonant) যেমন : চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

৩. মৌখিক (Oral) : ফুসফুস তাড়িত ধ্বনি যখন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে শুধু মাত্র মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে মৌখিক ধ্বনি (Oral) বলা হয়। কিন্তু ধ্বনির এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ভিতরও কিছুটা বাধা থাকে। কারণ কিছু বাধা না পেলে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হবে না। বাংলা ভাষায় চার ধরনের মৌখিক ধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো— কম্পিত, তাড়নজাত, উষ্ম ও পার্শ্বিক। এই জাতীয় ধ্বনি গুলো হলো- র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, ঃ।

কম্পিত ধ্বনি (Trilled/Rolled) : ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বের হওয়ার সময়, যদি জিহ্বা বা আলজিহ্বা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কম্পনের সৃষ্টি করে, তা হলে তাকে কম্পিত ধ্বনি বলা হয়। বাংলাতে র ধ্বনিটি কম্পিত ধ্বনি। আলজিহ্বার কম্পনে সৃষ্ট ধ্বনি বাংলাতে নেই। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় এই জাতীয় র ধ্বনি পাওয়া যায়। এর উচ্চারণ হয়ে থাকে র্‌র্‌র্‌ ধরনের। এই জাতীয় ধ্বনিকে তরল ধ্বনি হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

তাড়নজাত ধ্বনি (Flapped/Tap) : জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর দিকে উঠিয়ে একটি বারের তাড়নায় এই ধ্বনি তৈরি করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় দুটি রয়েছে। ধ্বনি দুটি হলো- ড এবং ঢ়।

উষ্ম ধ্বনি (Fricative/Spirant) : ফুসফুস থেকে শ্বাস বেরিয়ে যাবার পথ কোথাও সঙ্কুচিত করার কারণে, বাতাসে এক ধরনের শিস্ জাতীয় শব্দের সৃষ্টি হয়। সাপের শ্বাস ছাড়ার মতো এই ধ্বনিকে ইংরেজিতে বলা হয় হিস্‌হিস শব্দ (hissing sound)। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এর নামকরণ করেছিলেন আশ্রয়ী (Spirant) বা শিস্ ধ্বনি (Sibilant) হিসাবে। শ্বাসের ঘর্ষণজাত প্রক্রিয়ায় উত্পন্ন শিস্ জাতীয় ধ্বনি উষ্ম (নিঃশ্বাস) ধ্বনি বলা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় ধ্বনিগুলো হলো- শ, ষ, স, হ।

পার্শ্বিক ধ্বনি (leteral) : ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়, জিহ্বার অগ্রভাগ তালু অংশের দিকে স্পর্শ করে বাধা প্রদান করলে, বাতাস জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় হঠাৎ করে জিহ্বার ডগা উপরের অংশ থেকে সরিয়ে নিলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকেই পার্শ্বিক ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাতে এই জাতীয় ধ্বনি হলো ল। এটি তরল ধ্বনি নামেও চিহ্নিত করা হয়।

১.১.৩. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি : বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় কিছু ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে একটি বাড়তি হ ধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়। এই সকল ধ্বনিতে মূল ধ্বনির সাথে হ ধ্বনিটি এমনভাবে মিশে থাকে যে, তাকে পৃথক শোনা যায় না। এই বিচারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

অল্পপ্রাণ (Unaspirated) : ক। যে সকল ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে হ ধ্বনি যুক্ত হয় না, তাকে অল্পপ্রাণ (Unaspirated) ধ্বনি বলে। বাংলাতে এই জাতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো হলো- ক, গ, ঙ, চ, জ, ঞ, ট, ড, ণ, ত, দ, ন, প, ব, ম, র, ল এবং ড়।

মহাপ্রাণ (Aspirated) : যে সকল ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে হ ধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে মহাপ্রাণ (Aspirated) ধ্বনি বলে। বাংলাতে এই জাতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো হলো- খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, ঢ় এবং হ।

১.১.৪. ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি : স্বরতন্ত্রী সামান্য উন্মুক্ত করে ফুসফুসের বাতাসকে সজোরে সঞ্চালিত করলে, স্বরতন্ত্রী দুটো তীব্রভাবে কাঁপতে থাকে। এর ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে ঘোষ ধ্বনি (Voiced Sound) বলে। কিন্তু স্বরতন্ত্রী দুটো একটু বেশি প্রসারিত করলে, বাতাস স্বরতন্ত্রীর প্রান্তদেশ ছুঁয়ে যায় মাত্র। এর ফলে স্বরতন্ত্রী অপেক্ষাকৃত কম কম্পিত হয়। এর ফলে যে ধ্বনি উত্পন্ন হয়, তাকে বলা হয় অঘোষ (Unvoiced Sound)।

ঘোষ ধ্বনি (Voiced Sound) : বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ : গ, ঘ, ঙ; জ, ঝ, ঞ; ড, ঢ, ণ; দ, ধ, ন; ব, ভ, ম। অন্যান্য বর্ণ : য, র, ল, ব, হ।

অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced Sound) : বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ : ক, খ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ)। অন্যান্য বর্ণ : শ, ষ, স, ঃ ও সকল ফিসফিস করে উচ্চারিত ধ্বনি।

বাংলা ব্যাকরণে অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, অঘোষ ও অঘোষের সমন্বয়ে যে তালিকা তৈরি করা হয়, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

অল্পপ্রাণ-অঘোষ : ক, চ, ট, ত, প।
অল্পপ্রাণ-ঘোষ : গ, ঙ, জ, ঞ, ড, ণ, দ, ন, ব, ম, য, র, ল, ড়।
মহাপ্রাণ-অঘোষ : খ, ছ, ঠ, থ, ফ।
মহাপ্রাণ-ঘোষ : ঘ, ঝ, ঢ, থ, ভ, ঢ়।

১.১.৫. ঘৃষ্টধ্বনি (Affricates sound) : জিহ্বাকে ও দন্তমূলের সাথে যুক্ত করে, হঠাৎ তা বিযুক্ত করে বহির্গামী ধ্বনি প্রেরণ করলে, ঘৃষ্ট (Affricates) জাতীয় ধ্বনি তৈরি হয়। বাংলাতে এই ধ্বনিগুলো হলো- চ, ছ, জ, ঝ।

১.১.৬. অর্ধ-স্বর ধ্বনি (Semi-vowel sound) : এমন কিছু ধ্বনি আছে, যেগুলোকে সঠিকভাবে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির ভিতর ফেলা যায় না। ধ্বনি বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় ধ্বনিকে অর্ধ-স্বর (Semi-vowel) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাতে

এই জাতীয় ধ্বনি হলো য়। এছাড়া বাংলায় ব্যবহৃত ব-শ্রুতি এই জাতীয় ধ্বনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১.২. ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি (Non-pulmonic Airstream)

এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস এর সাথে বায়ু সংযোগে সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটে। ফুসফুসের সাথে বায়ু প্রবাহের বিচ্ছেদের ঘটনাটি দুটি ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এর একটি হলো স্বরতন্ত্রীতে, অপরটি স্নিগ্ধ বা কোমল তালুতে। সেই কারণে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনিকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ দুটি হলো– রুদ্ধ-স্বরপথ-চালিত বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি (Glottalic Airstream) এবং স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহজাত ধ্বনি (Velaric Airstream)।

১.২.১. রুদ্ধ-স্বরপথ-চালিত বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি (Glottalic Airstream) : আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথটিকে স্বরপথ বলা হয়। এই স্বরপথ বন্ধ করে দিলে, ফুসফুসের সাথে স্বরতন্ত্রের উপরিভাগের বায়ু-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় রুদ্ধ-স্বরপথ-চালিত বায়ু প্রবাহজাত ধ্বনি। এই জাতীয় ধ্বনি আবার দুটি প্রক্রিয়ায় হতে পারে। এই প্রকার দুটি হলো– বহিঃস্ফোটক ও অন্তঃস্ফোটক।

ক। বহিঃস্ফোটক (Ejective): স্বরতন্ত্রীর মধ্যস্থ স্বরপথ বন্ধ করে দেওয়ার পর পুরো স্বরযন্ত্রকে (larynx) একটু উপরের দিকে উঠালে, ঊর্ধ্বকণ্ঠের জায়গা কমে যায়। ফলে স্বরতন্ত্রীর উপরিভাগ থেকে মুখবিবর বা নাসিকা রন্ধ্র পর্যন্ত একটি ঘন বায়ুস্তম্ভ তৈরি হয়। এই অবস্থায় মুখ বা নাসারন্ধ্রের বাধা দূর করলে, বায়ু সশব্দে মুখ বা নাসিকা পথে নিষ্ক্রান্ত হয়। হিক্কাধর্মী এই শব্দকে বহিঃস্ফোটক বলা হয়। আন্তর্জাতিক বর্ণমালায় এর জন্য ’ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় ধ্বনির ব্যবহার নেই। পাশের চিত্রে এই জাতীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক লিপির তালিকা দেওয়া হলো।

খ। অন্তঃস্ফোটক (Implosive): স্বরতন্ত্রীর মধ্যস্থ স্বরপথ বন্ধ করে দেওয়ার পর পুরো স্বরযন্ত্রকে একটু নিচের দিকে নামালে, ঊর্ধ্বকণ্ঠের জায়গা বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বরতন্ত্রীর উপরিভাগ থেকে মুখবিবর বা নাসিকা রন্ধ্র পর্যন্ত একটি হাল্কা বায়ুস্তম্ভ তৈরি করে। এই অবস্থায় বাইরের বাতাস মুখ বা নাসারন্ধ্র দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়, তাকে অন্তঃস্ফোটক ধ্বনি বলা হয়। প্রমিত বাংলা উচ্চারণে এই জাতীয় ধ্বনির ব্যবহার নেই।

এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী সজোরে কম্পিত হয়। সেই কারণে এই জাতীয় ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষ অন্তঃস্ফোটক (Voiced Implosive)। আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে মোট ৫টি ধ্বনিকে নির্দেশিত করা হয়েছে। পাশের চিত্রে এর নমুনা দেখানো হলো।

১.২.২. স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহজাত ধ্বনি (Velaric Airstream): জিহ্বার পশ্চাত্ভাগ দ্বারা স্নিগ্ধতালু অবরোধ করে, ফুসফুসের সাথে বাতাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এই জাতীয় ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। এই অবরোধের পর পশ্চাৎ জিহ্বাকে সামনের দিকে এগিয়ে আনার চেষ্টা করলে মুখের ভিতরের বাতাস বাইরে চলে আসে। একে বলা হয় স্নিগ্ধতালু-চালিত বহির্গামী বায়ু প্রবাহ (Egressive veleric airstream)। কিন্তু ঠিক এর উল্টো পদ্ধতিতে জিহ্বার পশ্চাত্ভাগ গলার দিকে নামিয়ে আনলে মুখের ভিতর বাতাস প্রবেশ করে। একে বলা হয় অন্তর্গামী বায়ু প্রবাহ। আর এর ফলে যে ধ্বনি তৈরি হয়, তাকে বলা হয় অন্তর্গামী শীৎকার বা কাকুধ্বনি (Ingressive click)। বাংলা ভাষাভাষীরা নিত্য প্রয়োজনে বিবিধ শীৎকার ধ্বনি ব্যবহার করে থাকেন। শীৎকার উৎপন্নের স্থান বিবেচনায় একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগগুলো হলো–

১. ওষ্ঠাধর শীৎকার (Bilabial click): ঠোঁট দুটো চেপে ধরে, তারপর হঠাৎ তা উন্মুক্ত করে ভিতরে বাতাস টেনে নিলে যে ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় ওষ্ঠাধর শীৎকার। স্বাভাবিক ওষ্ঠাধর শীত্কারের শব্দের প্রকৃতি অনেকটা শিশুর গালে সশব্দে চুমু দেওয়ার মতো। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ওষ্ঠাধর শীৎকার রয়েছে। এই ধরনগুলো নির্ভর করে ওষ্ঠাধরের কুঞ্চন, প্রসারণ, বর্তুলকরণ ইত্যাদির উপর। যেমন–

ক। অধরিক শীৎকার (labial click) : ওষ্ঠাধর প্রসারিত না করে এবং ওষ্ঠাধরকে গোল না করেই এই জাতীয় শীৎকার সৃষ্টি করা হয়। শুধু মাত্র ঠোঁট স্পর্শ করে স্বাভাবিক চুম্বনের শব্দ পাওয়া যায় এই শীত্কারে। এর অন্য একটি সমার্থ শব্দ হলো-চুমকুড়ি।

খ। বর্তুলাকার ওষ্ঠাধর শীৎকার (Rounded Bilabial click) : ওষ্ঠাধর গোল করে এবং যথেষ্ঠ প্রসারিত না করে এই ধ্বনি করা হয়। কৃষকেরা গরু, মহিষ জাতীয় পশুকে ডাকার জন্যও এই জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকেন।

গ। বর্তুলাকার প্রসারিত ওষ্ঠাধর শীৎকার (Rounded Spreaded Bilabial click): ওষ্ঠাধর প্রসারিত করে এবং গোল করে

এই শীৎকার উৎপন্ন করা হয়। সতৃষ্ণ চুম্বনে এই জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি হয়। কৃষকের গরু, মহিষ জাতীয় পশুকে আহ্বান করার জন্যও এই জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকেন।

ঘ। প্রসারণকৃত ওষ্ঠাধর শীৎকার (Spreaded Bilabial click) : ঠোঁট দুটো প্রসারিত করে এই ধ্বনি উত্পন্ন করা হয়। এর ফলে প্অ প্অ জাতীয় ধ্বনি উত্পন্ন হয়। বিষাদ বা আনন্দ প্রকাশের জন্য অনেকে এই জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকেন।

২. দন্ত্য শীৎকার (Dental click): প্রথমে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দাঁত স্পর্শ করে দাঁতের গোড়ালিতে জিহ্বা পেতে দিয়ে বাতাসকে মুখের মধ্যে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। পরে হঠাৎ করে জিহ্বাকে উঠিয়ে নিলে মুখের ভিতর বাতাস প্রবেশের কারণে যে ধ্বনির উত্পন্ন হয়, তাকে বলা হয় দন্ত্য শীৎকার। এই ধ্বনি দুই ভাবে হতে পারে। যেমন-

ক। দন্ত্য শীত্কারের সময় যদি ঠোঁট প্রসারিত থাকে, তাহলে চ্অ জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করা। অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, আক্ষেপজাতীয় ভাব প্রকাশের জন্য এই ধ্বনি ব্যবহার করা হয়।

খ। দন্ত্য শীত্কারের সময় যদি ঠোঁট গোলাকার হয়, তবে তার উচ্চারণ হয় চ্উ ধরনের। এর প্রকৃতি অনেকটা কুকুর জাতীয় প্রাণীর জলপানের শব্দের মতো। কখনো সহানুভূতি প্রকাশের জন্য এই ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হাঁস-মুরগীকে খাবার দেওয়ার সময় এই জাতীয় শব্দ করে ডাকা হয়।

৩. উত্তর দন্ত্যমূলীয় শীৎকার (Post alveolar click) : প্রথমে জিহ্বার অগ্রভাগ উত্তর দন্তমূলে লম্বভাবে স্থাপন করা হয়, পরে জিহ্বাকে নিচের দিকে ছিটকে টেনে আনলে, জিহ্বার অগ্রভাগ নিচের চোয়ালের মাড়িতে আঘাত করে। এর ফলে যে যুগপৎ ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাকেই উত্তর দন্তমূলীয় ধ্বনি বলা হয়। এক্ষেত্রে ঠোঁট প্রসারিত বা গোলাকার হতে পারে। ঘোড়ার দ্রুত গতির ধ্বনি বুঝাতে আমরা এই জাতীয় ধ্বনি করে থাকি।

৪. তালুদন্তমূলীয় শীৎকার (Palatoal alveolar click) : জিহ্বাকে উল্টিয়ে এর অগ্রভাগ তালুতে রেখে, জিহ্বাকে সজোরে দন্তমূলের দিকে টান দিলে এই ধ্বনি উত্পন্ন হয়। সরু মুখ বিশিষ্ট খালি বোতলের মুখে তালু দ্বারা আঘাত করে ছেড়ে দিলে এই জাতীয় ধ্বনি তৈরি হয়। কৃষকরা গোরুর গাড়ি চালানোর সময় দ্রুত গতিতে গরুকে চলার জন্য এই জাতীয় ধ্বনি উত্পন্ন করে থাকেন।

৫. দন্ত্যমূলীয় পার্শ্বিক শীৎকার (alveolar leteral click): জিহ্বাকে দন্তমূলে আবদ্ধ করে, জিহ্বার দুই পাশ সংকুচিত করে বাতাস টেনে নেওয়ার সময় এই জাতীয় ধ্বনি তৈরি করা হয়। খুব শীতে কাতর হয়ে এইভাবে ধ্বনি করা হয়।

৬. শিস্ধর্মী শীৎকার (Hissing click): জিহ্বাকে মূর্ধা বরাবর এনে, ঠোঁট দুটো ঈষত্ গোল বা প্রসারিত করে মুখের ভিতর সজোরে বাতাস টেনে নিলে, এই জাতীয় ধ্বনি উত্পন্ন হয়। সাধারণত খুব ঝাল লাগলে আমরা এই জাতীয় ধ্বনি করে থাকি।

৭. স্বরতন্ত্রী শীৎকার (vocal click): কণ্ঠ্যকে সংকুচিত করে বাতাস টেনে নেওয়ার সময় এই জাতীয় ধ্বনি তৈরি করা হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার হটেন্টট, বান্টু গোষ্ঠীর লোকেরা এই জাতীয় ধ্বনি তাদের মূল ভাষাতেই ব্যবহার করে থাকে। প্রবল যৌন উত্তেজনায় নারীকণ্ঠ থেকে এই জাতীয় শীৎকার ধ্বনি পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট